পরিবিষয়

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

চাঁদ দেখতে গিয়ে আমি

সব শিশুকেই প্রথম চাঁদ দেখায় তার মা। তাই মধ্যবয়সেও মায়ের মুখে হঠাৎ চাঁদের কথা উঠলে সেটা অন্য মাত্রা পায়। মনোযোগ কেড়ে নেয়। মাস কয়েক আগে সপ্তাহান্তের ফোনে সেদিন মা হঠাৎ চাঁদের কথা বলতে শুরু করলো। এইই, যে কলকাতায় একটা নতুন চাঁদ এসেছে। আর মা, পরপর কয়েক সন্ধ্যায়, বার্ধক্যজনিত নানা শারীরিক ক্লেশের মধ্যেও ফ্ল্যাটবাড়ির ৭তলার ছাদে উঠে সেই নীল নীল চাঁদ দেখতে যায়। আত্মীয়স্বজনদের ফোন ক'রে সেই নীলচন্দ্রকলা দেখতে প্ররোচিত করে। সবচেয়ে ঘননীল চাঁদ ওঠে অগাস্টের ৩০/৩১ তারিখ। আর তারই ৫- ৬ দিন আগে, মাসের ২৫ তারিখ নীল আর্মস্ট্রং মারা যান।

যার প্রথম মানবপদছাপ পড়েছিলো পৃথিবীর ওই ক্ষুদ্র আন্তর্গ্রহে, সেই লোকটাকে বিদায়বার্তা জানাতেই চাঁদ তার সামলে রাখা জ্যোৎস্নাকে শোকনীল করে ফেলেছিলো এমন যাঁরা ভাবলেন, তাঁদের কল্পনা ও রোমান্টিকতার প্রতি যেমন কবি হিসেবে আমার 'তামাম তারিফ ঝরে পড়লো', তেমনি এক এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনীয়র হিসেবেও।

নীল আর্মস্ট্রংকে অনেকে বলেন বিশ শতকের সবচেয়ে বিখ্যাত মানুষ। স্কুল কলেজে গেছেন এমন মানুষ গোটা পৃথিবীতে খুব কম যিনি এই মহাকাশচারীর নাম শোনেননি। যে বছর তিনি চন্দ্রপৃষ্ঠে প্রথম পা রাখলেন, আমরা তখন শিশু। সে সময় একটা র‍্যাচেট দেওয়া প্লাস্টিকের খেলনা বেরয় ভারতে - নীল আর্মস্ট্রংয়ের নামে। এই খেলনাটা ছিলো আমার অতীব প্রিয়। প্লাস্টিকের র‍্যাচেট আকাশের দিকে তাক করে টেনে বের করে নিলেই, সেই র‍্যাচেটের সঙ্গে লাগানো ছোটো হেলিকপ্টারটা কয়েক সেকেন্ডের জন্য আকাশে উড়তো।

ক্লাস ফোরে পড়ি যখন, এর আরো কয়েক বছর পর, উত্তম- অপর্ণার ''জয়জয়ন্তী'' ছবি বেরিয়েছে। আমাদের হেড- মিসট্রেস চ্যাটার্জি- আন্টি (তৃপ্তি) অমনোযোগী ক্লাসকে শান্ত করতে এক একদিন ক্লাসে গানের আসর শুরু করে দিতেন – ''কে প্রথম চাঁদে গেছে বলো তো নাম?''। আর আমরা বাচ্চারা সমস্বরে চিৎকার করে বলতাম – ''নীল আর্মস্ট্রং''। এর অনেক পরে জেনেছিলাম আমার মতো আর্মস্ট্রংও এক এয়ারোস্পেস ইঞ্জিনীয়র। থাকতেন আমাদের বর্তমান বাড়ির বিশ মাইলের মধ্যে। ঈশ্বরবিশ্বাসী নীল একটা চ্যাপেল তৈরি করেছিলেন সিনিসিন্যাটির ইন্ডিয়ান হিলস অঞ্চলে। আর্মস্ট্রং চ্যাপেল।

পৃথিবী ও চন্দ্রের এই একমাত্র কিংবদন্তীটির সাথে যে আমার একদিন দেখা হয়ে যাবে এবং আমাদের কয়েক মিনিটের সংলাপে জেনে যাবো চাঁদ সম্বন্ধে তাঁর একান্ত ব্যক্তিগত বিরল এক মনোভাব আর তার সঙ্গে এক বাঙালি কবির একটা কবিতার কী সম্পর্ক এসব কথা বলতেই আজকের এই লেখা। কিন্তু কখন, কীভাবে কী কথা হয় তাহার সাথে - সেখানে যাবার আগে চাঁদের থেকে আরো কয়েক লক্ষমাইল দূরের এক লোহিতগ্রহে একবার ঘুরে আসা দরকার।

মঙ্গল।

কেন মঙ্গলগ্রহে ঘুরুতে যাচ্ছি হঠাৎ সে প্রসঙ্গে কৌতূহলী পাঠিকাকে বলি এর সঙ্গে ‘‘কৌতূহল’’- এর এক অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আছে। আর তেমনই অবিচ্ছিন্ন এক সম্পর্কে আমিও কখন সেই ‘‘কৌতূহল’’এর সাথে বাঁধা পড়েছি আমি নিজেও জানতাম না।

কারিগরি গণিত আমার পেশা। কবিতার বাইরে একে দ্বিতীয় নেশাও বলা যায়। পারিগাণিতিক জ্যামিতি নিয়ে নানারকমের কাজ করে থাকি যা শেষপর্যন্ত একটা সফটওয়েরে ভ’রে, গ্রাফিক সহায়ক যোগ ক’রে বাজারে ছাড়া হয়। সেই সফটওয়ের কেনেন কারিগরী কাম্পনিগুলো, যাঁদের ইঞ্জিনিয়ররা এগুলোকে ব্যবহার ক’রে গাড়ি, জাহাজ, প্লেন, আর্মিট্যাঙ্ক ইত্যাদির নকশা বানান। ফলে আমাদের গাণিতিক গবেষণা ও সূত্র যে কোথায় ঠিক কিভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটা আমরা বেশিরভাগ সময়েই জানতে পারিনা। এ দিয়ে যেমন কেউ বানাচ্ছেন মানুষের নানা মারণরোগ ধ’রে ফেলার হাজারো জীবনদায়ী যন্ত্র, কেউ আবার মারণাস্ত্র বানাচ্ছেন; কেউ বানাচ্ছে উন্নতমাণের গলফ বল, কেউ অ্যানিমেশন ফিল্ম, সেই আধুনিকতম প্রস্থেটিক- পা, কেউ বাচ্চাদের ডায়পার, আবার ক্যালিফোর্নিয়ার এক ডিসাইন ইন্সটিটিউটের দুই অধ্যাপক নকশা করছেন এক বাহারি মসৃণ ব্রাসিয়ের (ব্রা)।

এইভাবেই এ বছরের মাঝামাঝি জানতে পারলাম যে নাসা (NASA) আমাদের অ্যালগরিদ্ম ও কোড ব্যবহার ক’রে CURIOSITY নামে এক বিচিত্র যান্ত্রিক- প্রাণীর জন্ম দিয়েছেন। অনেক পরীক্ষা- নিরীক্ষার পর মঙ্গলগ্রহে সেই ভ্রামককে (Mars Rover) পাঠানো হচ্ছে। নাসা ও সিমেন্সের (Siemens) এই মিলিত প্রয়াসকে স্বাগত জানাতে আমাদের অগাস্ট মাসের ৫তারিখ ভোররাতে অফিসের হলঘরে আমন্ত্রণ জানানো হলো। নাসার বিশেষ সম্প্রচারে দেখানো হলো কিউরিওসিটি ভ্রামকের মঙ্গল অবনমন। কীভাবে আমার নিজস্ব অ্যালগরিদম- অংশটা ব্যবহার করেছেন নাসা- র নকশিরা তার কিছু নমুণা দেখেছিলাম। কাজেই সে নিয়ে কোনো ধোঁয়াশা ছিলো না। কিন্তু দেয়ালজোড়া পর্দার সামনে বসে ভ্রামক নামানোর ক্রিয়াকলাপ দেখতে দেখতে যে শিহরণ হলো সেই অতীন্দ্রিয় অনুভূতির সাথে কবিতার অনুভূতির অশরীরী যোগাযোগ আমি বুঝতে পারিনি আজো। হয়তো কোনোদিনই পারবোনা। আর এই না- পারাটা, এই অনচ্ছতাই কবিতার ঘনতাকে ক্রমশ চূড়ান্ত করে তোলে।

CURIOSITY Rover কীভাবে মঙ্গলে নেমে কী ধরণের তথ্য সংগ্রহ করছে কীভাবে এ সম্বন্ধে অনেক বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ ও সংবাদ লেখা ও প্রচারিত হয়েছে। ইউ- টিউবে এখন অজস্র ভিডিও রয়েছে। কবিতার বিষয় নয় ব’লে এর মধ্যে যেতে চাই না বরং সেই বিস্ময়কর যন্ত্রপ্রাণীর একটা ছবি দিলাম।

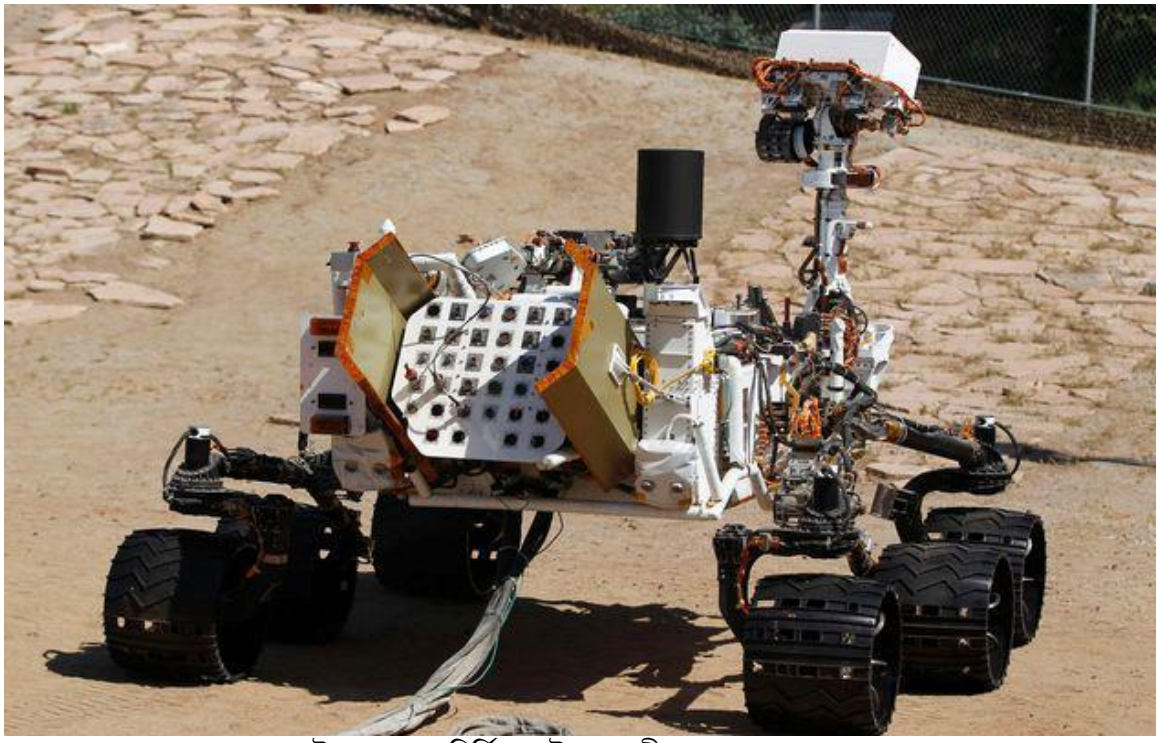

NASA ও SIEMENS-এর যৌথ প্রয়াসে নির্মিত কৌতূহলোদ্দীপক CURIOSITY মঙ্গলভ্রামক (Mars Rover)

বিস্ফারিত জ্ঞানকুম্ভে অনেক বছর ধ'রে অনেকটা অসহায় সাঁতার দেবার পরেও যে কুয়াশা ও শিহরণ থেকে যায় তার সুতো ছাড়তে পারিনি। এই শিহরণের সাথে কবিতার আপাত বিসম্পর্কের বিরোধিতা করতে করতে ২০১২ সালের অগাস্ট মাস থেকে আমরা এবার দ্রুত পিছিয়ে যাবো কয়েক বছর। অন্য এক শহরে অনুষ্ঠিত এক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে। সাল ২০০৬। পুজোর সময়। উত্তর অ্যামেরিকার দক্ষিণের রাজ্য অ্যালাব্যামার বার্মিংহাম শহরকেন্দ্রে এক হোটেলে রয়েছি ক'দিন। উদ্দেশ্য এক গণিত সম্মেলনে পেপার পড়া। রাস্তার উল্টোদিকে বার্মিংহাম শিল্প-স্মৃতিঘরে একদিন সান্ধ্যভোজ। আমন্ডের গুঁড়ো দিয়ে ভাজা এক মশলাদার চিকেন ডিশে সবে মনোযোগ করছি এমন সময় ব্যাঙ্কোয়েট স্পিকার আমাদের সামনে এলেন তাঁর উপস্থাপনা নিয়ে। বার্মিংহাম অ্যালাব্যামা বিশ্ববিদ্যালয়েরই এক অধ্যাপক। নাম লরেন্স ডি-লুকাস।

যৌবনে অধ্যাপক ডি- লুকাস।
কলাম্বিয়ার প্রথম নিক্ষেপের সময়ে।

যে কলাম্বিয়া মহাকাশযান কল্পনা চাওলাকে নিয়ে পার্থিব অবনমনের সময়ে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যায়, সেই কলাম্বিয়ার প্রথম মহাকাশাভিযানের সময় অধ্যাপক ডি- লুকাস ছিলেন পে- লোড স্পেশালিস্ট। কোনোদিন কোনো নভোচরকে সামনাসামনি দেখিনি। ওই প্রথম। অসামান্য এক কথক অধ্যাপক ডি- লুকাস। সুস্বাদু ভোজ থেকে মুহূর্তে আমাদের সমস্ত মনোযোগ কেড়ে নিয়ে দেখাতে লাগলেন ১৯৯২ সালের কলাম্বিয়ার প্রথম সফরের নানা ছবি, ভিডিও। গভীর সরসতার সাথে জানাতে থাকলেন মহাকাশ ও মহাকাশভ্রমণ সম্বন্ধে নানা অজানা তথ্য, তাঁর নিজস্ব অভিজ্ঞতার এক মনোজ্ঞ ক্ষুদ্রে বিবরণী। কিন্তু একইসঙ্গে অধ্যাপক আরো একটা দিকে আলো ফেলতে শুরু করলেন যা নিয়ে বিজ্ঞান জগতের কোনো বক্তা সাধারণত গণিতজ্ঞ শ্রোতাদের সামনে আলোচনার উপযোগী বলে মনে করেন না। লরেন্স ডি- লুকাস তার মন ও অনুভূতির কথা বলতে থাকলেন। ওই চোদ্দ দিনের মহাকাশ সফরে ওঁর মনের মধ্যে কী কী ঘটছিলো। নিক্ষেপের সময় যখন প্রতি ৪৫ মিনিটে একবার ক'রে সূর্যোদয় দেখছেন সেই সূর্যের দীপ্তি ও প্রকাশের সৌন্দর্য নিয়ে অভিভূত হয়ে পড়লেন।

তারপর একসময় লরেন্স বললেন – "আমি হাজার মাইল দূর থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে এমন সমস্ত দৃশ্য দেখেছিলাম, এমন সব অনুভূতিজারিত হতাম তখন, পরে মাটিতে নেমে আসার পর মনে হত নাসা কি একদল মাথামোটাদের জোট? না হলে তারা কোনোদিন কোনো কবি, শিল্পীকে কেন মহাকাশে পাঠালো না? কুকুর বেড়ালও তো পাঠালো। আমার বারবারই মনে হয়েছে সেই সমস্ত দৃশ্যের থেকে একজন শিল্পী, একজন কবি এমন কিছু সত্য খুঁজের বের করতেন যার নাগাল আমরা পাই না"।

বক্তৃতার শেষে বাথরুমের সামনে অধ্যাপকের সাথে আলাপ করি। নিজের প্রথম পরিচয় দেবার পর যখন দ্বিতীয় পরিচয়টাও দিই, লরেন্স হেসে ওঠেন। একটু বিস্মিতও হন। বললেন – "যাক অন্তত একজন কবি এইসব কথা শুনলো। আমি ভাবছিলাম আপনারা সকলে হয়তো আমাকে পাগলাটে মানুষ ভাবছেন। সাধারণত এইসব অস্পষ্ট, ভাবুক কথাবার্তা বিজ্ঞানীরা পছন্দ করেন না। আমার কিন্তু সত্যিই এসব মনে হয়েছিলো। না হলে বুঝতেই পারছেন এসব

আপনাদের মতো গণিতের লোকেদের বলতে যাবো কেন?" সেদিন কোনো মহাকাশচারীকে প্রথম করমর্দন করতে গিয়ে শুধু রক্তমাংশের টের নয়, আসে আরো এক সুরেলা দুয়েন্দে, আসে এক অনাবিল ইথারের ছোঁয়া – যারা পাখির গায়ে হাত দিয়েছেন তারা জানেন। যেভাবে ঘ্রাণ জানে সে মাংসের, খিদে জানে সে ঘ্রাণের। কেবল পাখির মাংস যারা ছাড়ান, তারা জানেন না।

সমানুপাতে যদি বিশ্বাস না করি আমার বিজ্ঞানবোধ ব্যর্থ। একমাসও কাটলো না। পয়লা নভেম্বর, ২০০৬। ব্যাঙ্কে গেছি টাকা তুলতে। দেখি কর্মিরা সব ছুটির মেজাজে। এক রূপালি চুলের বৃদ্ধকে ঘিরে গালগল্প চলছে। একজন কর্মিকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন – "সেকি! ওঁকে তো গোটা পৃথিবী চেনে!"

ক্লাস সেভেনের স্মৃতি মনের উপদ্রুত অঞ্চল জুড়ে আচমকা ফিরে আসে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটা কবিতার কথা মনে পড়ে যায়। সত্তর দশকের ইস্কুল- কলেজের ছেলেরা একটা খেলা খেলতো – বুক- ক্রিকেট। বইয়ের পাতা উল্টে উল্টে পৃষ্ঠা সংখ্যার শেষ অক্ষরকে রান হিসেবে ধরা হতো। ৮ আর ৫ পড়লে ১ রান, ৭ পড়লে ৩। আর শূন্য হলে আউট। টেবিলের নিচে বাবার জমানো পুরনো দেশ পত্রিকা। এভাবে এক দুপুরে বুক- ক্রিকেট খেলতে খেলতে ১৯৬৯ সালের এক সংখ্যার একটা পাতায় চোখ আটকায়। সে বছর সবে মানুষের পা পড়েছে চাঁদে। সেই চন্দ্রবিজয়ের ধাক্কা সামলাতে না পেরে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এক কবিতা লিখেছেন। কুয়াশাহীন সেই কবিতায় কবি আক্ষেপ করেছেন – আর কোনো কবি বোধহয় চাঁদকে নিয়ে আর কবিতা লিখবেনা কোনোদিন।

বারো বছর বয়সে বুঝতে পারিনি সেদিন কেন চাঁদকে নিয়ে আর কবিতা লেখা যায় না! তার সোনার অঙ্গে মানুষের পদাঘাত লেগেছে ব'লে? পাখির গায়েও তো সহস্র মানুষের হাত পড়ে রোজ, পাথর ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলো প্রথম প্রস্তরযুগের মানুষ, আকাশ ছেঁদা করে দিয়েছে এযুগে আমাদের ফ্রেয়ন, আমাদের শ্রেনীবন্ধুরা খুন করে চলেছে লক্ষ লক্ষ গাছ। তাও তো কবিতায় রোজ লোকে "গাছ" বলে, "পাখি" বলে, "পাথর" বলে। আমার সেদিনকার ছোট মনে কবির সেই অনুতাপ প্রবেশ করেনি। ৩৬ বছর পরে আমার মস্তিষ্ক আরো ক্ষুদ্রকায়। সেখানে আজো ঢোকেনি কবি নীরেন্দ্রনাথের সেদিনকার আকুতির সারমর্ম।

নীল আর্মস্ট্রং, কয়েক বছর আগে

সেই লোক। যে তেতাল্লিশ বছর আগে চাঁদের গায়ে পা ঠেকিয়েছিলেন বলে আর্তনাদ ক'রে উঠেছিলেন কবি নীরেন্দ্রনাথ – সেই লোক আমার তিন ফুটের মধ্যে দাঁড়িয়ে। নীল আর্মস্ট্রং। ব্যাঙ্ক থেকে বেরিয়ে আসছি। নীল আর্মস্ট্রংও আসছেন। ওঁর জন্য দরজা ধরে দাঁড়িয়ে, কী মনে হলো, বললাম

- স্যার, আপনাকে একটা প্রশ্ন করবো?
- করুন। (সহাস্য)
- আপনি কিছু মনে করবেন না। বোকার মত বলছি। আমি পেশায় ইঞ্জিনীয়র, তবু প্রশ্নটা বোকাবোকা হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, আপনি কি চাঁদের দিকে আজো তাকান?

ছ- বছরের শিশুর চেয়েও নিম্নমানের প্রশ্নে আমি নিজেই প্রচন্ড লজ্জা পাই, কিন্তু মাটিতে মিশি না। আর্মস্ট্রং বেশ কিছুক্ষণ মাটিতে তাকিয়ে ভাবেন। তারপর বলেন

- চাঁদের দিকে? চাই কি না? হ্যাঁ, চেয়ে দেখি তাকে। বিশেষ ক'রে পূর্ণিমার রাতে অনেকক্ষণ চেয়ে দেখি। কী অপূর্ব রূপ। কী অপূর্ব! তাই না? মানে, কি জানেন? ... ... মানে, এর চেয়ে কী বলবো। আমি বলতে পারিনা। এমন অপরূপ।

আমি আমার গাড়িতে ফিরে যাই। গায়ে এত কাঁটা সেদিন, জীবনে ওই একবারই নিজের শরীরে সজারুর অস্তিত্ব টের পেয়েছিলাম। যাঁর পায়ের ছোঁয়ায় চাঁদের সব ঘোর নাকি কেটে গিয়েছিলো, নীরেনবাবুর ভগ্ন হৃদয় ডুকরে উঠেছিলো, এত বছর পরেও সেই লোক পূর্ণিমা রাতের ঘোর কাটাতে পারেন না। আসলে কবি কে? কারা কবি? এই আমার অমীমাংসিত ঘোর।

কবিতা ক্রমাগত এক অস্পষ্টতার খোঁজ করে। এমনকি বিশ্লেষণ- ব্যাখ্যার যাবতীয় স্বচ্ছতার পরেও। নির্ধারণের পরেও তাকে খন্ডন করে পৌঁছতে চায় নতুন নেবুলায়। নতুন কুয়াশার নবতম বাষ্পের তনুমধ্যে। পাখির ফেলে যাওয়া পালক যেমন তার অস্পষ্ট অতীতের দিকে আমাদের ঝুঁকিয়ে নামায়, একইসঙ্গে তার বর্তমান অস্তিত্বের অনুমানে আমরা নতুন অস্বচ্ছতার খোঁজ করি।

কেউ বলেন সত্যের খোঁজে গেছে কবিতা। কেউ বললেন – সত্যের পেছনে যে সত্য, তার খোঁজে। আসলে সত্য সর্বদাই অসত্য, অসমাপ্ত। তাই খোঁজ। বনজঙ্গল তন্ন তন্ন করে খুঁজে পাওয়া গেলনা, তবু চলমান অশরীরী রোজ আসছে বাবলুর স্বপ্নে। আর আমার স্বপ্নে মহাকাশচারীরা। শূন্যতা ছাড়া কিইবা গায়ে লেগে আছে সেই মহাকাশচারীদের!

তাই কি তাদের দেবদূতের মতো লাগে?
পাখির গানকে মনে হয় পাখির সর্বোচ্চ সম্পত্তি!
সুর আসে তার পালক কুড়িয়ে?
বিস্কুটের গুঁড়োই কি আমাদের বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়?

==* * *==

প্রথম প্রকাশঃ কবিসম্মেলন, মার্চ, ২০১৩